Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 061-074
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনীতি ও নীতি শাস্ত্র: প্রসঙ্গ মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

অজয় কুমার বিশ্বাস*

সারকথা: *দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম শাখা নীতিশাস্ত্রের তুলনায় অর্থনীতি নবীন হলেও উভয়ের অস্তিত্ব আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষের জীবন প্রণালিতেও বিদ্যমান ছিল। সেই অর্থে বিষয় দুটি সমকালীন, আদর্শবাদী বিজ্ঞান (normative science) এবং উভয়েরই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক রয়েছে।*

নীতিশাস্ত্র আদর্শবাদী বিজ্ঞান। তবে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই আদর্শবাদ (ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ প্রভৃতি বিচার) শ্রেণি-নিরপেক্ষ নয়। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে মালিকশ্রেণির প্রাপ্য মুনাফার উৎস উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ যা আবার শ্রমিক শ্রেণির জন্য ন্যায্যতা-পরিপন্থি।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে নীতিনিষ্ঠতার এই সংকট ছিল না। আধুনিক সাম্যবাদী সমাজেও তা থাকবে না। অর্থনীতি যেমন ইতিবাচক বিজ্ঞান (positive science) তার চেয়ে আরও বেশি আদর্শবাদী বিজ্ঞান (normative science)। কি উৎপাদন হচ্ছে, কীভাবে কোন কৌশলে উৎপাদন হচ্ছে এসব বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, কেন এসব উৎপাদন হচ্ছে? এসব উৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রাণীজগৎ ও ভূমণ্ডলে কেমন হবে? এসব উৎপাদন করা কি উচিত? এসব উৎপাদন অব্যাহত থাকলে তা ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার জন্য সংকট না সম্ভাবনা বয়ে আনবে? তা বিচারের আরো বেশি আবশ্যকতা রয়েছে।

আজকের এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে একচেটিয়া পুঁজিপতি, বহুজাতিক কোম্পানি, তাদের পাহারাদার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা (WTO, IMF, IBRD ইত্যাদি) মুনাফার হার ঠিক রাখতে গিয়ে, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে, পরিবেশ বিধ্বংসী অর্থনীতি ও যুদ্ধ অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। বাজার দখল করতে গিয়ে নিজেরা এমন সব সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যা প্রাণী জগৎসহ ভূমণ্ডলের অস্তিত্বেও সংশয় সৃষ্টি করেছে। এই সংকট পুঁজিবাদ সৃষ্ট। বর্তমান সমাজকাঠামোর মধ্যে এর মীমাংসা সম্ভব নয়। এই সংকট নিরসনের জন্য উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এমন উৎপাদন সম্পর্ক সমৃদ্ধ উৎপাদন প্রণালী (Mode of Production) আবশ্যক যা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উৎপাদন প্রণালীতে দেখা যায়। এখানে উৎপাদনের উপকরণের (Means of production) ব্যক্তিগত মালিকানা নেই বলে উৎপাদন

* অধ্যক্ষ, সরকারি নুরুন নাহার মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ

সম্পর্কে (Production relation) বণ্টন ব্যবস্থাও বৈষম্যমূলক নয়। ফলে উৎপাদন শক্তির বিকাশে (Production Force) উৎপাদন সম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

সমাজ বিকাশের এই পর্যায়ে আদর্শবাদী অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়, উদ্ভব ঘটে সমতার অর্থনীতির। নীতিশাস্ত্র এই পর্যায়ে এসে অবমুক্ত হয় স্ববিরোধিতা থেকে। অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র যথাক্রমে সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো হিসেবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র

'যে শাস্ত্র ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দের যথার্থ সংজ্ঞা দেয়, তাকে নীতিশাস্ত্র বলে। সমাজ জীবনে কতগুলো আচরণ, কতগুলো অভ্যাস নিন্দিত ও প্রশংসিত এবং তাদেরই নীতি বলা হয়। মানুষের সমাজ জীবনের এই দিকটি সৎ বা অসৎ এই দু'ভাবে চিহ্নিত করা হয়, ঐ বিষয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাকেই নীতিবিজ্ঞান বলে।'[১] ইংরেজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নীতিবিদ্যা। Ethics শব্দটি গ্রীক শব্দ Ethica থেকে এসেছে। Ethica শব্দটি এসেছে Ethios শব্দ থেকে যার অর্থ চরিত্র, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি বা অভ্যাস। Ehics কে moral philosophy বা নৈতিক দর্শন বলা হয়। Moral শব্দটি ল্যাটিন Mores থেকে এসেছে, যার অর্থ রীতিনীতি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, নীতিবিদ্যাকে মানুষের রীতিনীতি বা অভ্যাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

'সুতরাং, নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় উইলিয়াম লিলি বলেন: 'We may define ethics as the normative science of the conduct of human beings lining in societies- a science which judges this conduct to be right or wrong to be good or bad or in similar way'. [২]

দার্শনিক অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ভাষায়, 'নীতিবিদ্যা হচ্ছে মানবজীবনের আদর্শ অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান বা সাধারণ বিষয়।'[৩]

'নীতিবিদ্যা হল এমন একটি আদর্শমূলক বিজ্ঞান যা মানবজীবনের পরম আদর্শ এবং আদর্শ লাভের সহায়ক নৈতিক নিয়মগুলো নির্ধারণ করে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণকে ভাল কি মন্দ তা বিচার করে। যেহেতু নীতিবিদ্যা আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে গভীর করে সেহেতু নীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক।'[৪]

নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ ভালো-মন্দ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা। যদিও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এ ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের সাধারণ অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। জীব-জগতে প্রায়ই দেখা যায়, যে কর্ম এক প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক সে কর্মই অন্য প্রাণীর জীবন সংহারের কারণ। 'নৈতিকতা কোন ধর্ম বা ধর্মগুলোর নিজ নিজ আঙ্গিকের সম্পদ নয়। এর ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বজনীন অবস্থান রয়েছে। মার্কসবাদ এই নৈতিকতা লালন করে।' [৫]

---

১. মোঃ আফছার আলী ও মোঃ রবিউল আউয়াল, 'সাধারণ নীতিবিদ্যা', কবির পাবলিকেশন্স পৃ.৩

২. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, 'নীতিবিদ্যা'। অকসর পাবলিকেশন, পৃ. ৪।

৩. মোঃ আফছার আলী ও মোঃ রবিউল আউয়াল, 'সাধারণ নীতিবিদ্যা', পৃ. ৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫. আখতার সোবহান খান, 'মার্কসবাদ ও ন্যায়পরায়ণতার ধারণা', প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, বাংলা একাডেমি প্রকাশিত।

অর্থনীতি

'অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে (পৃ. ৫১ ও ৫২) আবুল বারকাত, দেশবিদেশের পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার নির্যাস ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন অনুসারে স্বল্প ভাষায় বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন অর্থশাস্ত্র হলো:

১. "গার্হস্থ্য বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট বিদ্যা" (জেনোফেনস, খ্রি.পূ.৪৩০-৩৫৪; এ্যারিস্টটল, খ্রি.পূ.৩৮৪-৩২২)।

২. "সম্পদের বিজ্ঞান"(ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জনক এডাম স্মিথ, ১৭২৩-১৭৯৪; রবার্ট ম্যালথাস, ১৭৬৬-১৮৩৪; জে.বি. সেঁই, ১৭৬৭-১৮৩২; ডেভিড রিকার্ডো, ১৭৭২-১৮২৩; জন স্টুয়ার্ট মিল, ১৮০৬-১৮৭৩), এডাম স্মিথের মতে,'অর্থশাস্ত্র জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে'; জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য বলেছেন, 'অর্থশাস্ত্র হলো সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রায়োগিক বিজ্ঞান'

৩. **"কল্যাণের বিজ্ঞান"** (নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদদের মতে; যাঁদের মধ্যে আলফ্রেড মার্শাল, ১৮৪২-১৯২৪; হার্বার্ট ডেভেনপোর্ট, ১৮৬১-১৯৩১; আর্থার সেসিল পিগু, ১৮৭৭-১৯৫৯)

৪. "অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান" এতকালের এ প্রচলিত ধারণা বাতিল ঘোষণা করে লায়নেল রবিন্স (১৮৯৮-১৯৮৪) বললেন, অর্থশাস্ত্র মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্ক-বিষয়ক মানুষের স্বভাব-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে।

৫. "কর্মসংস্থান ও আয়-এ দুয়ের সম্পর্ক নির্ধারণী বিজ্ঞান"-এ কথা বলেছেন জন মেইনার্ড কেইনস্ (১৮৮৩-১৯৪৬)।

৬. "পছন্দের বিজ্ঞান" বা "বাছাই করে নেবার বিজ্ঞান" বলেছেন পল স্যামুয়েল সন (১৯১৫-২০০৯)।

GRAHAM, BANNOCK, R.E. BAXTER AND EVAN DA প্রণীত THE PENGUIN DICTIONARY OF ECONOMICS (Fifth edition)-এ Economics সম্পর্কে বলা হয়েছে:

Economics is the study of the production, distribution and consumption of wealth in human society. Economists have never been wholly satisfied with any definition of their subject. This one is as good as any. It should not be interpreted to restrict the subject-matter of economics to the positive aspects of material welfare alone.

ROBBINS has criticized this limitation by pointing out, for example, that the economy of war, which may destroy material welfare, is an aspect of choice in the use of resources and therefore a proper subject for economic inquiry. His definition was: 'Economics is the science whice studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.' In fact, no short definition can convey to the beginner the scope and flavour of the whole subject as it has evolved. The reader will gain a good notion of the scope of economics by examining the coverage of this dictionary, but the borderlines between such other disciplines as psychology, sociology, accounting and

geography are not easily defined and it is, perhaps, not particularly productive to attempt to do so. Political economy, an early title for the subject, now sounds old-fashioned but usefully emphasizes the importance of choice between alternatives in ceonomics which remains, despite continuing scientific progress, as much of an art as a science.

নীতিবিদ্যার স্বরূপ [৬]

নীতিবিদ্যা এক ধরনের বিজ্ঞান যা মানব আচরণের যথোচিত বা অযথোচিত ইত্যাদিকে নৈতিক মানদন্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করে থাকে। কিন্তু নীতিবিদ্যা মানদন্ড হিসেবে যেসব আদর্শকে মেনে নেয় তা অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে আলাদা। নীতিবিদ্যা সাধারণত আদর্শনিষ্ঠ বা নিয়মনিষ্ঠ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নীতিবিদ্যার স্বরূপ কী এ প্রশ্নের সঙ্গে মূলত কয়েকটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, সেগুলো হ'লঃ

নীতিবিজ্ঞান কি বর্ণনামূলক (Positive science) বিজ্ঞান নাকি আদর্শনিষ্ঠ (Normative science) বিজ্ঞান

নীতিবিজ্ঞান কি তাত্ত্বিক (Theoritical) নাকি ব্যবহারিক (Practical) বিজ্ঞান? নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলোকে নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য উত্থাপিত হচ্ছে। নীতিদার্শনিক ও নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, নীতিবিজ্ঞান কি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান?

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান মূলত 'আদর্শ'-এর অনুসন্ধান করে। বিপরীতক্রমে, নির্ধারিত আদর্শের আলোকে কোনোকিছুর মূল্যায়ন করাও এর লক্ষ্য। আমাদের মানব অভিজ্ঞতার জগতে তিন ধরনের আদর্শ কাজ করে,

১. সত্য (Truth): আমাদের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
২. সৌন্দর্য (Beauty): আমাদের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত।
৩. শুভ বা ভালো (Good): আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত।

এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে তিনটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের সন্ধান মেলে

ক. সত্যের আদর্শ নিয়ে যুক্তিবিদ্যা
খ. সুন্দরের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে নন্দনতত্ত্ব।
গ. শুভ বা ভালোত্বের আদর্শ নিয়ে নীতিবিদ্যা আলোচনা করে। 'নৈতিক মূল্য অবধারণ'-এর স্বরূপ, প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করাই নীতিবিদ্যার কাজ। সুতরাং, নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। ভালোত্বের আদর্শ নিয়ে কাজ বা আচরণের মূল্য বিচার করাই এর লক্ষ্য।

---

৬. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, 'নীতিবিদ্যা', প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০০৩, পৃ. ০৭-১১।

উইলিয়াম লিলির ভাষায়, সমাজে বসবাসকারী মানুষ ব্যতীত নৈতিক আচরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য নীতিবিদ্যার আদর্শিক ভিত্তি হ'ল সমাজ। এই বিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় সামাজিক আদর্শের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়। এদিক থেকে নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির ব্যাখ্যা অনুসারে নীতিবিজ্ঞানেরও বিজ্ঞানের মতো দুটি দিক রয়েছে। নীতিবিজ্ঞানের যেমন রয়েছে নৈতিক ঘটনা তেমনি রয়েছে আইন এবং আদর্শ। সুতরাং, প্রথম দিক থেকে নীতি সম্পর্কিত বিদ্যাটি একটি বিজ্ঞান আবার দ্বিতীয় দিক থেকে এটি আদর্শনিষ্ঠ। নীতিবিজ্ঞানের আদর্শনিষ্ঠ দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নীতিবিজ্ঞান

নৈতিক ঘটনা (ethical fact)

নৈতিক আদর্শ বা নিয়ম (ethical norms or ideal)

উপরের পর্যালোচনা অনুযায়ী নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, নীতিবিজ্ঞান কি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান?

নীতিবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানকে অনেক সময় বর্ণনামূলক বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও বলা হয়। এ ধরনের বিজ্ঞান প্রধানত 'ঘটনামূলক সত্য' (Factual truth) নিয়ে আলোচনা ও সেই সত্যের কারণ আবিষ্কার করে। "What it is" বা 'এটি কী' বা এর অবিকল বর্ণনা (as it is) দেয়াই বিজ্ঞানের কাজ। বস্তুনিষ্ট বিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে, অন্যান্য কিছুর সঙ্গে এর সম্ভাব্য সম্পর্কের ধরন কী রকম হবে তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। কিন্তু নীতিবিদ্যা এ ধরনের বর্ণনা বা কার্যকারণিক সম্পর্কের তথ্য দেয় না। কিংবা মানব আচরণের স্বরূপ, প্রকৃতি, বিকাশ এবং মানবীয় কর্মকাণ্ডকে বিশেষ কোনো আইনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে না। অথবা আচরণের মধ্যে কোন প্রকার কার্যকারণিক সম্পর্ক আবিষ্কার করাও নীতিবিদ্যার লক্ষ্য নয়। নীতিবিজ্ঞান যে কাজটি করে তা হ'ল:

১. মানবীয় আচরণ যেভাবে আছে কিংবা এর প্রকৃতিগত বর্ণনা দেয়া নীতিবিদ্যার কাজ নয়।

২. নীতিবিদ্যা মূলত 'কীভাবে আচরণ করা উচিত' তার বিশ্লেষণ করে।

৩. নীতিবিদ্যা মানবীয় আচরণ প্রসঙ্গে কতকগুলো আদর্শের ভিত্তিতে মূল্য অবধারণ করে।

৪. নীতিবিদ্যা তথ্যমূলক অবধারণের চেয়ে মূল্যায়নমূলক অবধারণ নিয়ে বেশি আলোচনা করে। আর 'তথ্যমূলক অবধারণ' ঘটনা বা তথ্যের শুধু বিবরণ প্রকাশ করে। অন্যদিকে, অবধারণটি কীভাবে হওয়া উচিত তার স্বরূপ নিয়ে 'মূল্যায়নমূলক অবধারণ' আলোচনা করে। এ কারণে নীতিবিদ্যার অবধারণ হ'ল মূল্যায়নমূলক অবধারণ।

মূরহেড এর মতে, বিজ্ঞান কিছু অংশ তাত্ত্বিক এবং কিছু ব্যবহারিক। তিনি মনে করেন, ব্যবহারিক দিকের ভিত্তিতে নীতিবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করা হয়। কেননা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাত্ত্বিক। মূরহেড-এর ধারণা, জ্যোতির্বিদ্যা বা শরীরতত্ত্বের চেয়ে নীতিবিদ্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাছে। তিনি এ কথার দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, নীতিবিদ্যা একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এসব

দিক বিবেচনায় নীতিবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান। অনেক নীতিবিদ মনে করেন, নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ ও ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং কীভাবে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান দেয়; সে অর্থে নীতিবিদ্যা ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

এরিস্টটল বলেন, নীতি দার্শনিকদের স্থায়ী আগ্রহ একাধিক ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। নৈতিক অন্তদৃষ্টির গভীরতা অনুভব করে, সে দর্শন তার আগ্রহ ও মূল্যের দিক থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ই হয়ে থাকে।

সেথ-এর মতে, তত্ত্বকে অনুশীলন থেকে পৃথক করা চলে না, সে অর্থে নীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ই। নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয় শর্ত এবং যে বিজ্ঞান এই অন্তর্দৃষ্টি গভীরভাবে অনুসরণের কথা বলে, সেই বিজ্ঞান একাধারে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নীতিবিদ্যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালনার জন্য কোনো নিয়ম তৈরি বা সরবরাহ করে না। নীতিবিদ্যায় আলোচিত মতবাদগুলো তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন এই মতবাদগুলোর কোনো ব্যবহারিক যোগসূত্র থাকে।

অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

মানুষের ক্রমবিবর্তনের ঊষালগ্ন থেকে অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কীয় কর্মের উদ্ভব। আদিমকালের মানব সমাজের জীবন-যাপন প্রণালীর ব্যবচ্ছেদ করলে বিষয় দুটির উপস্থিতি অনুভূত হবে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষ মূলত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ এবং পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ উৎপাদন কার্যক্রমের মত জটিল প্রক্রিয়ার উপযোগী ছিল না। তবে সে সময়ে মানুষের মধ্যে শ্রম বিভাজন ছিল, এ শ্রমবিভাজন প্রকৃতিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যেমন মেয়েরা শিশু লালন পালন ও ফলমূল সংগ্রহের কাজ করেছে এবং পুরুষেরা পশু শিকার ও শিকারের উপাদান সংগ্রহের মত কাজ করত। প্রকৃতিকে বুঝতে পারার সীমাবদ্ধতা, হিংস্রপ্রাণীর সাথে লড়াই করে টিকে থাকা, বৈরি প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মরক্ষার কৌশল অনুসন্ধান ইত্যাদি নানা প্রচেষ্টা আদিম মানব সমাজ যৌথভাবে চালিয়েছে। টিকে থাকার স্বার্থেই সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সম্পত্তির উপর সামাজিক মালিকানা বিদ্যমান থাকায়, সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর স্বল্পতা ও প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা এবং প্রকৃতির বৈরি পরিবেশে দলবদ্ধভাবে টিকে থাকার উপায় হিসেবে খাদ্য ও অন্যান্য সংগৃহীত দ্রব্য সমান ভাগ করে ব্যবহার করার নীতির জন্ম হয়েছিল। কার্ল মার্কস এ জন্যই এ সমাজকে 'আদিম সাম্যবাদী মানব সমাজ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সমবণ্টন ও গোষ্ঠীর সব সদস্যের ক্ষুধা মেটানোর প্রয়াস অর্থনীতি ও সুনীতির পারস্পরিক নির্ভরতার শর্ত পূরণ করে।

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের (আদিম সাম্যবাদী, দাস, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী সমাজ) সাথে সাথে শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের শাখা এ দুটি বিষয় আদর্শবাদী বিজ্ঞান এবং উভয়েরই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক রয়েছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে (দাস, সামন্ত ও পুজিবাদী সমাজ) প্রভু/মালিক/শোষকদের সুনীতি দাস/ভূমি দাস/শ্রমিকদের জন্য কু-নীতি হয়ে পড়ে। এই জন্য শ্রেণিহীন সমতাভিত্তিক অর্থনীতিক সমাজে কেবল সবার গ্রহণযোগ্য সুনীতির দেখা মিলবে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ হলে শ্রেণিহীন সমাজে সুনীতির এ দ্বৈত চরিত্রের অবসান হবে।

'অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য' (২০১৮: ৬৬) গ্রন্থে, আবুল বারকাত লিখেছেন, "মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ৫০ লক্ষ বছরের। আর আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বয়স তার চেয়ে একটু কম, এবং তাও ৪৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর। কিন্তু আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদ বলতে তেমন কারও সাক্ষাৎ মেলা ভার এবং তখন অর্থনীতিশাস্ত্র ছিল মূলত নৈতিক দর্শনের অথবা নীতিশাস্ত্রীয় দর্শন অথবা ইতিহাস শাস্ত্রের (Moral Philosophy বা history) একটি শাখা মাত্র।" তিনি সেইসাথে পাদটিকায় লিখেছেন, "১৯০২ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রি দেবার প্রচলন ছিল না। ঐ সময় পর্যন্ত অর্থনীতি বিষয়টি নীতিশাস্ত্র অথবা ইতিহাস এর উচ্চতর পর্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্তির শর্তাধীন একটি বিষয় ছিল। ১৯০৩ সালে, আলফ্রেড মার্শালের অনেক বছরের প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রির ব্যবস্থা করা হয়। এর পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে ডিগ্রি প্রবর্তন হয়।" এ অর্থে অর্থনীতি একটা অর্বাচীন বিষয়।

মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানব সমাজ কাঠামো সবসময় সমাজ-মানুষের জীবন প্রণালী থেকে উৎসারিত। এটি গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। কয়েকটি স্তর পেরিয়ে মানব সমাজ বর্তমান স্তরে পৌঁছেছে। প্রতিটি স্তরের সমাজ কাঠামোর রূপ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যথা:

১. আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক বা সাম্যবাদী সমাজ
২. দাস সমাজ
৩. সামন্তবাদী সমাজ
৪. পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ ও
৫. সমাজতান্ত্রিক সমাজ যার আরও বিকশিত রূপ হচ্ছে আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ।

সমাজ কাঠামো একটি অখণ্ড সত্তা যার অঙ্গিভূত প্রতিটি উপাদান পরস্পর নির্ভর ও সম্পর্কিত। সমগ্র সমাজ দুটি কাঠামোয় বিভক্ত। যেমন:

১। মৌল কাঠামো (Basic Structure)
২। উপরি কাঠামো (Super Structure)।

সমাজ কাঠামো দ্বিমাত্রিক। মার্কসের ভাষায় মৌল কাঠামো উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক তথা অর্থনীতি। উপরি কাঠামো মৌল কাঠামোর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে যার মধ্যে থাকে সংস্কৃতি ও সামাজিক দিক।[৭]

উৎপাদন প্রণালি/উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা:

উৎপাদন প্রণালি-পদ্ধতির (Mode of Production)[৮] প্রধান দুটি দিক হল উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। আবার উৎপাদন শক্তির দুটি দিক হল উৎপাদনের উপায় বা উপকরণ যা আবার শ্রম সহায়ক

৭. মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ কে এম শওকত আলী খান, 'প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান', পৃ. ১৬২ ও ১৬৩।
৮. মনোরঞ্জন দে, 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি', পৃ. ৮ ও ৯।

উপকরণ ও শ্রম প্রয়োগের সামগ্রীতে ভাগ করা যায়। অন্যটি হল উৎপাদনের ব্যাপারে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের শ্রম শক্তি। উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যথা: (১) উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার প্রকৃতি (২) সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং (৩) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ বিতরণের প্রকৃতি।

উৎপাদন প্রণালি (Mode of production) তথা উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারা পাঁচটি পৃথক স্তরে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

(১) আদিম গোষ্ঠীগত বা সাম্যবাদী সমাজ (Primitive communal society) (২) দাস সমাজ (slave society) (৩) সামন্তবাদী সমাজ (feudal society) (৪) পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ (capitalist society) ও (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ (Socialist society) যার আরও বিকশিত রূপ আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ (Modern communist society)। এ পাঁচটি স্তরে পাঁচটি পৃথক উৎপাদন প্রণালী লক্ষ্য করা যায়। একটি স্তরের উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সাথে পরবর্তী ও পূর্ববর্তী স্তরের উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কে প্রকৃতিগত ও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। আবার কোনো একটি স্তরের সাথে অপর স্তরের উৎপাদনশীল শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার প্রতিটি স্তরের উৎপাদন প্রণালীর উদ্ভব, বিকাশ ও অবলুপ্তি প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ধাপ পরিলক্ষিত হয়।

অর্থাৎ মানব সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরের রয়েছে নিজস্ব উৎপাদন প্রণালী। নিম্নতর সামাজিক স্তরের উৎপাদন প্রণালী থেকে উন্নতর সামাজিক স্তরের উৎপাদন প্রণালীর গুণগত ও পরিমাণগত মান অপেক্ষাকৃত বিকশিত ও উন্নততর। আদিম সমাজবাদী সমাজের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের চেয়ে দাস সমাজব্যবস্থার উৎপাদন শক্তি যেমন, অপেক্ষাকৃত বিকশিত এবং উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদন প্রণালীর (Mode of production) প্রধান দুটি দিক উৎপাদন শক্তি (production foroce) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (production Relation)। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

উৎপাদন শক্তির দুটো দিকের একটি উৎপাদনের উপায় বা উপকরণ যা মানুষ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে অথবা নিজেরা তৈরি করে নেয়। উৎপাদন শক্তির দ্বিতীয়টি হল উৎপাদনের ব্যাপারে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের শ্রম শক্তি। এটির বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন মানুষ যত বুঝতে পারবে, উৎপাদন কর্মসহ জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পন্ন করতে করতে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার সামাগ্রিক পরিবেশ উপলব্ধিসহ শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঘটে।

উৎপাদন সম্পর্কের[৯] মধ্যে থাকবে (১) উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানার প্রকৃতি (যেমন, ব্যক্তিগত বা সামাজিক মালিকানা); (২) সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থান ও তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক

---

৯. কোনো সমাজের উৎপাদন উপকরণগুলোর মালিকানার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক হয় তাকে বলে উৎপাদন সম্পর্ক। আদিম সাম্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে উপকরণগুলোর সামাজিক মালিকানা বা যৌথ মালিকানার কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয় বৈষম্যহীন পক্ষান্তরে দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান থাকায় যারা শ্রমশক্তি ছাড়াও অন্যান্য উপকণের মালিক এবং অন্য মানব গোষ্ঠী যারা কেবলমাত্র শ্রমশক্তিরই

যেমন পুঁজিবাদী সমাজে থাকে মালিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি, উদ্বৃত্ত লুণ্ঠনকারী ও উদ্বৃত্ত সৃজনকারী; (৩) বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ বিতরণের বিভিন্ন প্রকৃতি (আদিম সাম্যবাদী ও আধুনিক সাম্যবাদী সমতার ভিত্তিতে উৎপাদিত সম্পদ বণ্টনের শর্ত বিদ্যমান থাকে; পক্ষান্তরে দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজে সম্পদ বণ্টনে অসমতার শর্ত লক্ষ্য করা যায়)।

উৎপাদন প্রণালী বা পদ্ধতির বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, সমাজের এই মৌল কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সমাজের উপরি কাঠামো তথা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, নীতি নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির অবয়ব ও প্রকৃতি নির্ণিত হয়।

যে সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন প্রণালীতে বা মৌলকাঠামোতে বা অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত সে সমাজে উদ্বৃত্ত শোষণও স্বীকৃত। এ জন্য সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রেণি শোষণ এবং তা মেনে নেয় এমন নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধের এই অবস্থানে কোনো অসুবিধা হয় না। সমাজের বিকাশে মৌল কাঠামোর (Basic structure) নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা থাকলেও উপরি কাঠামো (Super sturucture) মৌল কাঠামোকেও প্রভাবিত করে সমাজের আমূল পরিবর্তনে। মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় Mode of production structure অনেকটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রের মতই কাজ করে।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। পুঁজিবাদ পণ্য উৎপাদনের ও বিনিময়ের এমন এক স্তর যখন উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানা সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণির মানুষের হাতে থাকে। আর অন্য দিকে সমাজের বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী তাদের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবনধারণে বাধ্য হয়। এ সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের মূলত দুটো স্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রাক একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্তর এবং অন্যটি একচেটিয়া পুঁজিবাদ। প্রথম স্তরে রয়েছে বাণিকতন্ত্র, কলকারখানার যুগ এবং শেষের স্তরে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ।

প্রায় সারা পৃথিবীর অর্থব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিশেষ করে, পৃথিবীর সব পুঁজিবাদী দেশে আজ একচেটি পুঁজিবাদী কারবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উদ্ভব হয়েছে ওলিগোপলি কার্টেল, সিন্ডিকেট, ট্রাষ্ট এবং কনসার্ন-এর মত বাণিজ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার।

পুঁজিবাদের বিকাশের এ পর্যায়ে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রিভূতকরণ ঘটেছে। শিল্প পুঁজির সাথে ব্যাংক পুঁজির সমন্বয় ঘটেছে, মূলধন রপ্তানি (পুঁজিবাদের প্রাক একচেটিয়া যুগে রপ্তানি হয় পণ্য কিন্তু একচেটিয়া যুগে পুঁজি রপ্তানি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়) প্রাধান্য পায়। এচেটিয়া পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা একত্রিত হয়ে সংঘ গঠনের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এই বণ্টন হয় মূলত শক্তির ভিত্তিতে। তাই শক্তির হ্রাস- বৃদ্ধির কারণে এই বণ্টনও স্থায়ী হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মূলত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে বিশ্ববাজার বণ্টন-পুনঃবণ্টনের নিমিত্তে সংঘটিত হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বহুজাতিক কোম্পানী। এদের শক্তি এত যে এদের

মালিক অর্থাৎ অন্যান্য উপকরণের মালিক নন তাদের মধ্যে দাসমালিক–দাস, সামন্ত প্রভু–ভূমিদাস ও মালিক- শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণিত হয়। উপকরণগুলোর মালিকানা মালিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে থাকার দরুন তারা অন্য শ্রেণির উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে সবধরনের শ্রেণি শাসন জারি রাখতে সক্ষম হয়। শ্রেণিশোষণ ভিত্তিক সমাজগুলোর রাষ্ট্রব্যবস্থা এই বৈষম্যকে লালন করে; এটাই এসব সমাজ বা রাষ্ট্রের নীতি নৈতিকতার অসমতা ও অমানবিক দিক।

চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক রাষ্ট্রকেই অকার্যকরী রাষ্ট্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে খনিজ তেল উত্তোলন ও বিপণনে নিযুক্ত বহু জাতিক কোম্পানী ও অস্ত্র উৎপাদনকারী একচেটিয়া কারবারীদের স্থান রক্ষা করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোকে প্রায় অকার্যকরী রাষ্ট্র করে ফেলে জনজীবনকে ধ্বংসাত্মক বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নেতৃত্বে লুণ্ঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের অনুষঙ্গমাত্র।

'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর'[১০] এ পর্যায়ে এসে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব (উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামাজিক উৎপাদন প্রণালী ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, সম্পদ বণ্টণের ক্ষেত্রে গৃহীত হয় বৈষম্যমূলক বণ্টন পদ্ধতি) এড়ানোর জন্য, মুনাফার হার ঠিক রাখার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের সেবা সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এমন সব পদক্ষেপ নেয় যা মানব সভ্যতাকেই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়। এরা গোটা পৃথিবীর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। পশ্চাদপদ মূল্যবোধ, অন্ধত্ব, সংকীর্ণ জাতি-গোত্র-গোষ্ঠী-বর্ণবাদকে উস্কে দেওয়ার মত অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করছে। আবার এর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সংকটই হল সমাজের আমূল পরিবর্তনের বা আরো বিকাশের objective Condition[১১] (নৈর্ব্যক্তিক শর্ত)। শোষিত নির্যতিত সর্বস্তরের মানবগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের এই পবিবর্তন সম্পন্ন হবে। আর এটিই হল পুঁজিবাদ-উত্তর বিকশিত উৎপাদন প্রণালী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি সৃজনের Subjective condition (কার্যগত শর্ত)।

নিরাপদ অর্থনীতির সন্ধানে

দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত পল সুইজির সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতি গ্রন্থের 'পুঁজিবাদ ও পরিবেশ' নিবন্ধে লিখেছেন (পৃ. ১৬৭-১৬৮)[১২]:

"মানবজাতি যে আজ তার দীর্ঘ ইতিহাসের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এ-কথা স্পষ্ট। পারমাণবিক যুদ্ধ মানুষের এই সাজানো সংসারকে নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু, এই বিপর্যয়কে যদি এড়ানোও যায়, তবুও আজ আমরা যাকে সভ্য সমাজ বলে জানি তার টিকে থাকার ও বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয় অবস্থা বজায় থাকবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আমরা বেঁচে থাকি ও বাঁচার রসদ সংগ্রহ করি মাটি, জল এবং বাতাস দিয়ে তৈরি যে বাস্তব পরিবেশ থেকে, ঐতিহাসিকভাবে ধরে নেওয়া হয়, তার স্থায়িত্ব অনন্ত ও এবং তাকে যতোখুশি ব্যবহার করা সম্ভব। তার মানে কিন্তু এই নয় যে পরিবশকে ধ্বংস করা যায় না। ইতিহাসে পরিবেশের অংশবিশেষ ধ্বংস করার (অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলার) বহু নজির রয়েছে, যার জন্য দায়ী হয় প্রাকৃতিক ঘটনা, নয়তো মানুষেরই কার্যকলাপ। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু মোটেই দুস্তর নয়। বহু পরিবেশ পরিবর্তনই এই দুইয়ের (প্রাকৃতিক ঘটনা ও মানুষ) সম্মিলিত কাজের পরিণাম। তবে, বিশাল ভূতাত্ত্বিক

১০. 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর', লেনিন।

১১. সমাজের পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক দুটি শর্ত: যথা (১) Objective Condition ও (২) Subjective Condition.

১২. পল সুইজি, 'সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি অর্থনীতি' গ্রন্থের 'পুঁজিবাদ ও পরিবেশ, এবং 'আজকে, ১৫০ বছর পরে কমিউনিস্ট ইশতেহার' নিবন্ধ দুটি থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৭-১৬৮, ১৯৮-১৯৯, দীপংকর চক্রবর্তী সম্পাদিত।

পরিবর্তনের মতো কিছু পরিবর্তন আছে যাতে মানুষের কোনো ভূমিকাই নেই, এবং জঙ্গল কেটে উড়িয়ে দেয়ার প্রভাবের ক্ষেত্রে আবার মানুষের কার্যকলাপই কেবলমাত্র দায়ী।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এসব বদলে যেতে শুরু করলো। প্রথমে নতুন বোমাটা মূলত তৎকালীন অস্ত্রগুলোরই উন্নত রূপ বলে ভাবা হয়েছিল; কিন্তু,পরস্পর সংযুক্ত ঘটনা-পরম্পরা ধীরে ধীরে জনগণের চেতনায় আমূল পরিবর্তন আনলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন যা আশা করা গিয়েছিল তার অনেক আগেই বোমা বানিয়ে ফেললো, ফলে এই ধারণাও চুরমার হয়ে গেল যে, এই শক্তি একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তারপর এল হাইড্রোজেন বোমা, যার বিধ্বংসী ক্ষমতা বহুগুণ বেশি, এবং এরই পর শুরু হল মহাশক্তির দেশগুলোর মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যা প্রচুর কথাবার্তা এবং কিছু প্রধানত প্রতীকী চুক্তি সত্ত্বেও, আজও অব্যাহত। আজ এটা সবাই জানে যে, প্রতিটি শক্তিধর দেশই তার প্রতিপক্ষকে বেশ কয়েকবার নিশ্চিহ্ন করে দেবার শক্তি ধরে; এবং বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে চালু গবেষণা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, এই প্রলয় যুদ্ধরত দেশগুলোর সীমা ছাড়িয়ে অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে, তেজস্ক্রিয় বিষক্রিয়া ও পারমাণবিক শীতের মত বীভৎস চেহারা নিয়ে। অতএব, অর্ধশতকের মতো অভাবনীয় কম সময়ে মানবজাতি তার পরিবেশের সুরক্ষা সম্পর্কে তুরীয় আত্মবিশ্বাসের অবস্থান থেকে নিশ্চিত হয়েছে যে, মুহূর্তের পারমাণবিক হিংসার এক দমকা হাওয়াই তার অস্তিত্ব, তথা তার প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো রকম জীবনকে ধারণ করার ক্ষমতাকে, নিশ্চিহ্ন করবার পক্ষে যথেষ্ট।"

উল্লিখিত গ্রন্থের ১৯৮ ও ১৯৯ পৃষ্ঠায় পল সুইজি 'আজকে, ১৫০ বছর পরে কমিউনিস্ট ইশতেহার' নিবন্ধে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলেছেন "মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁদের ছিল এই গভীর প্রত্যয় যে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ও অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বগুলোই ক্রমবর্ধমান এবং শেষ পর্যন্ত সফল বিপ্লবী লড়াই এর জন্ম দেবে, যা এই ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে তার জায়গায় অনেক বেশি মানবিক ও ন্যায় সঙ্গত এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নতর কোন সম্ভাবনা বা তার বাস্তব রূপ কি আদৌ মেলে? আমার ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তর বিতর্কাতীতভাবেই হচ্ছে না। ইশাতেহারের প্রথম দিকেই বস্তুত বুর্জোয়া ও সর্বহারা শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বহুল উদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছিল: আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত ও নীচুতলার মানুষ, ভূস্বামী ও ভূমিদাস, গিল্ড মালিক ও কারিগর এক কথায় শোষক ও শোষিত চিরকাল থেকেই পরস্পর বিরোধী হিসেবে, ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে গেছে, কখনো গোপনে, কখনো বা প্রকাশ্যে, এবং প্রতিবারই তা হয় সামগ্রিক সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনের মধ্যে, কখনো বা দ্বন্দ্বরত শ্রেণিগুলোর সাধারণ সর্বনাশে।"..." আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে দুনিয়ার মানুষের কাছে এই প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরা যায় যে, বুর্জোয়াতাত্ত্বিকরা যেমন আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইছেন পুঁজিবাদই হচ্ছে, 'ইতিহাসের অবসান', তা নয়, বরং পুঁজিবাদের অব্যাহত অস্তিত্বই ইতিহাসকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।"

সব মানুষের জীবনমানে উন্নয়ন ঘটবে অথচ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে সর্বনিম্ন এমন উৎপাদন কৌশল ও প্রক্রিয়া নির্বাচন পূর্বক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেমন (১) বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার তেমনি (২) মুনাফা নয় জনকল্যাণমুখী লক্ষ্য থাকা দরকার।

পুঁজিবাদ মুনাফা দ্বারা তাড়িত হয়ে বিগত ৩০০ বছরে পরিবেশের ক্ষতি করেছে। প্রাক একচেটিয়া পুঁজির যুগের চেয়ে একচেটিয়া পুঁজিরযুগে এই ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছে। দুটি মহাযুদ্ধ ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে লেগে থাকা আঞ্চলিক যুদ্ধ সকলেই মুনাফা তাড়িত কর্মসূচির বাস্তবায়ন মাত্র।

অর্থনীতি শাস্ত্রে নব্য উদারবাদী মতবাদ একচেটিয়া পুঁজি এবং তার রক্ষার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের "স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ববাজার, বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন রচনায় ব্যস্ত। শুধু তাই নয় ঐসব একপেশে বিধি বিধান নিয়ম কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তি বিধান তৈরির দায়িত্ব তাঁরা নিজে নিজেই নিয়েছেন, ফলে দুর্বল দেশের (উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরিব' দেশ) সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয়- প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। এহেন মহাবিপর্যয় থেকে মানুষ সমাজকে মুক্তি দিতে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও বিশ্ব কব্জাকরণ প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময়কাল কেটেছে সমাজভিত্তিক সামাজিক কাঠামোতে (আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিতে বা ব্যবস্থায়); যেহেতু মানুষ যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাসা করে তা স্থির-অনড় নয় (static নয়) তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (dynamic) এবং শেষ বিচারে প্রগতিমুখী; যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে আলোকিত করতে থাকবে; এবং যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মানবশ্রম-দক্ষতাসহ উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান আপাতদৃষ্টিতে 'অসীম শক্তিধর' উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে- সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানবকল্যাণকামী বৈশ্বিক এ সমাধান কোনো আপ্তবাক্য নয় ব্যাপারটা সময়ের। জটিল প্রক্রিয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তো বা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মতো 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নিকোলাস কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) মতো 'মহাবিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞানশাস্ত্রের মহাগৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) মতো নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা। বিষয়টি জ্ঞানতত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয়ই।"[১৩]

উপসংহার

মানব সমাজের বিবর্তনের ১ম (আদিম সাম্যবাদী সমাজ) ও ৫ম (আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ) স্তরে শ্রেণি শোষণ, সম্পদের/উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য ছিল না, থাকবে না। ২য় (দাস সমাজ), ৩য় (সামন্ততান্ত্রিক সমাজ) ও ৪র্থ (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ) স্তরে শ্রেণি শোষণ, সম্পদ/উৎপাদনের উপকরণ সমূহের ব্যক্তি মালিকানা, বণ্টন ব্যবস্থায় অসমতা বিদ্যমান ছিল এবং রয়েছে। সমাজ কাঠামোর দুটি স্তরঃ (১) মৌল কাঠামো (Basic structure) এবং (২) উপরি কাঠামো (Super sturucture)। মৌল কাঠামোতে থাকে অর্থনীতি উপরি কাঠামোতে থাকে সংস্কৃতি, শিল্পসাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি। ভিতর কাঠামোর আদলে গড়ে ওঠে উপরি কাঠামো, ভিতর কাঠামোর উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন/উত্তরণ ঘটলে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। তবে উপরি কাঠামোও ভিতর কাঠামোর বিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উল্লিখিত সমাজের সব স্তরের জন্য স্বতন্ত্র উৎপাদন প্রণালী রয়েছে। শোষণ ভিত্তিক শ্রেণি বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামো সমূহের মধ্যে

১৩. আবুল বারকাত প্রণীত 'অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য' প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৭, পৃ. ১৮০-১৮১ (মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, বাংলাদেশ)

পূঁজিবাদের উৎপাদন প্রণালী অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও সমৃদ্ধ। এই স্তরে মানব সভ্যতার অভূত উন্নয়ন ঘটেছে, আবার মানুষের চরম সর্বনাশের শর্ত এই স্তরেই উদ্ভব হয়েছে। অতি উৎপাদন, উপকরণের (Means of production) অতি উৎপাদন, পুজির চরম কেন্দ্রিকরণ, উৎপাদনশীল পুঁজির লগ্নি পূঁজিতে রূপান্তর ,পুঁজির যান্ত্রিকিকরণ, চরম বেকারত্ব, যুদ্ধ অর্থনীতির সম্প্রসারণ, উৎপাদনমূলক খাতের চেয়ে সেবা খাতের প্রাধান্য, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তর, মুনাফার হার ঠিক রাখতে গিয়ে কখনও মন্দা কখনো মুদ্রাস্ফীতির আগমন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে অস্থিতিশীল করে তোলে, সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহায়তায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সংস্থার করাল গ্রাসে পতিত হওয়া পক্ষান্তরে লক্ষকোটি মানুষের জীবনে দুর্বিসহ যাতনা, ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা, নিরাপত্তাহীনতা, প্রভৃতি বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার অক্ষমতা সর্বোপরি সর্বনাশের কালো ছায়া নেমে এসেছে। এই গগন প্রমাণ বৈষম্য সংকট মানব সৃষ্ট দুর্যোগ ও বন্ধাত্ব অপনোদন এর জন্য পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান এবং নীতিনিষ্ট সমতার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সব স্তরের বঞ্চিত মেহনতি মানুষের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা মানব সভ্যতাকে আরো বিকশিত করবে এবং রক্ষা করবে।